بسم الله الرحمن الرحيم

লণ্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৯ অক্টোবর, ২০০৪ মোতাবেক ২৯ ইখা, ১৩৮৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় রমযান মাসের প্রায় অর্ধেক অংশ অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে; আলহামদুলিল্লাহ্। আগামী বৃহস্পতিবার থেকে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা শেষ দশক আরম্ভ হবে। এই শেষ দশকে সাধারণত মসজিদগুলোর সৌন্দর্য বেড়ে যায় কিন্তু যেমনটি আমি পূর্বেও কয়েক বার বলেছি, আমরা একটি উন্নয়নশীল জাতি। আমাদের আনন্দ তখনই স্থায়ী আনন্দ বলে আখ্যায়িত হতে পারে অথবা তখনই কোন পুণ্যকর্ম দেখে আমাদের মন আনন্দিত হতে পারে যখন তা দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং সবসময় প্রতিষ্ঠিত থাকে; (অথবা) বর্তমানে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা যখন সবসময় দেখা গেলে। যাহোক, আমি বলছিলাম, আগামী জুমু'আ থেকে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা রমযানের শেষ দশক আরম্ভ হয়ে যাবে বরং বৃহস্পতিবার থেকেই (আরম্ভ হবে)। আর এতে (অর্থাৎ, এই দশকে) মসজিদগুলোতে সাধারণত সমারোহ, সৌন্দর্য ও উপস্থিতি আরো বেড়ে যায়। আর এর বিভিন্ন কারণও রয়েছে। **প্রথমতঃ** শেষ দশকে সবারই মনে হয় যে, শেষ দশক চলছে তাই বেশি বেশি দোয়া করে কল্যাণ লাভ করি। **আরেকটি কারণ হল,** মহানবী (সা.) এই শেষ দশকে লাইলাতুল কদরের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তা অর্জনের জন্য, এর কল্যাণরাজি লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ মানুষ যেহেতু এদিনগুলোতে বিশেষ করে রোযা রাখার জন্য প্রত্যেকে (ঘুম থেকে) উঠে পাশাপাশি তাহাজ্জুদ নামাযের জন্যও জাগ্রত হয়। নফল নামাযও পড়ে আর এই কল্যাণের কারণেই মসজিদমুখীও হয়। এছাড়া এই দিনগুলোতে বড় বড় মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির আরেকটি কারণ হল, এই শেষ দশকে **এতেকাফে বসা**। কাজেই, সাধারণতঃ যারা মসজিদে কম যায়, যারা কেবল জুমু'আর নামাযে বা দু' ঈদের নামাযে আসে তাদের মধ্য হতেও অধিকাংশ বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা নিয়ে রমযানের দিনগুলোতে মসজিদে আসে। কিন্তু যেমনটি আমি বলেছি, মু'মিনদের জামা'তের সৎকর্মের প্রতিযোগিতা, আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ পালন করার চেষ্টা-প্রচেষ্টা সাময়িক হওয়া উচিত নয়। যারা এই রমযান মাসে এসব সৎকর্ম করার সৌভাগ্য লাভ করেছে, এসব সৎকর্ম ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা এখন ইনশাআল্লাহ্ তা'লা (তাদের) সবাইকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা এবং দোয়া করা উচিত।

একটি বর্ণনায় এসেছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"রমযান মাসের প্রথম দশক রহমত (অনুগ্রহ) ও মধ্যবর্তী দশক মাগফিরাত (ক্ষমা) এবং শেষ দশক জাহান্নাম থেকে নাজাত বা মুক্তিদানকারী।"** **(সহীহ্ ইবনে খাযীমাহ্, কিতাবুস্ সিয়াম বাব ফাযলু শাহরু রমাযান)**

রহমত লাভের প্রথম দশকও পার হয়ে গিয়েছে আর দ্বিতীয় দশক– যেটিকে আল্লাহ্ তা'লা মাগফিরাত বা ক্ষমার দশক আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা এই দশকে তাঁর পানে অগ্রগামীকে স্বীয় ক্ষমার চাদরে আবৃত করেন। তাই এদিনগুলোতে সবাইকে আল্লাহ্ তা'লার এই ক্ষমার চাদরে আবৃত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে আমরা এ বছর আবার রমযানের মাধ্যমে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আর তাঁর এই আশিস, কৃপা এবং পুরষ্কারের কল্যাণেই আমরা এখন দ্বিতীয় দশক অতিক্রম করছি। এই দশকে (আমরা) যত বেশি ইবাদত করে তাঁর সামনে বিনত হয়ে, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাঁর নির্দেশিত পথে চলার চেষ্টা করব আর তাঁর বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের চেষ্টা করব, তাঁর ক্ষমা আমাদেরকে তত বেশি তাঁর গণ্ডিতে আবদ্ধ করতে থাকবে। তাঁর রহমতের (বা অনুগ্রহের) দ্বার তত বেশি আমাদের জন্য উন্মুক্ত হতে থাকবে। আমরা যত বেশি সৎকর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে থাকব তত বেশি আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য আমাদের সাহায্য করতে থাকবেন। আর আমাদের মাঝে সৎকর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যত বেশি শক্তি সৃষ্টি হতে থাকবে, এরপর যখন এভাবে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য যাচনা করে, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আমরা শেষ দশকে প্রবেশ করব তখন বলেছেন, এটি তোমাদেরকে আগুন থেকে মুক্তির কারণ হয়ে যাবে। তোমরা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভকারী হয়ে যাবে। আর এর বদৌলতে ভবিষ্যতে সৎকর্মে উন্নতি সাধনকারী এবং মন্দকর্ম পরিত্যাগকারী হয়ে যাবে, কিন্তু শর্ত হল; পবিত্র নিয়্যতে বা সৎ উদ্দেশ্যে এস্তেগফার করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এস্তেগফার এবং তওবা দু'টি (পৃথক) জিনিস। একটি কারণে তওবার ওপরে এস্তেগফারের প্রাধান্য রয়েছে। (অর্থাৎ, তওবার চেয়ে এস্তেগফার বড়;) "কারণ এস্তেগফার খোদা তা'লার মাধ্যমে অর্জিত সাহায্য ও শক্তি আর তওবা হল, নিজের পায়ে দাঁড়ানো। আল্লাহ্ তা'লার রীতি হল, তাঁর কাছে যখন কেউ সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন খোদা তা'লা (তাকে) এক শক্তি দান করবেন অতঃপর এই শক্তি লাভের পর মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। আর সৎকর্ম করার জন্য তার মাঝে এক শক্তি সৃষ্টি হয়ে যাবে। যার নাম تُوبُوا إِلَيْهِ তাই প্রকৃতিগতভাবেও এই বিন্যাসই (রাখা) হয়েছে। মোটকথা, এতে খোদান্বেষীদের জন্য একটি পদ্ধতি নিহিত রয়েছে যে, খোদান্বেষী সর্বাবস্থায় (যেন) খোদার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। খোদান্বেষী যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে শক্তি লাভ না করবে (ততক্ষণ পর্যন্ত সে) কী করতে পারবে। এস্তেগফারের পরে তওবা করার সামর্থ্য লাভ হয়। এস্তেগফার না (করা) হলে নিশ্চিত মনে রেখো, তওবার শক্তি মরে

যায়। এভাবে এস্তেগফার করার পর তওবা করলে পরিণামে يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى (সূরা হুদঃ ৩) অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সর্বোত্তম জীবনোপকরণ দান করতে থাকবেন। আল্লাহর তা'লার প্রচলিত রীতি হল– যদি এস্তেগফার এবং তওবা কর তাহলে তোমার (প্রাপ্য) সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে। প্রত্যেক ইন্দ্রীয়ের একটি গণ্ডি আছে যেখানে তা ক্রমান্বয়ে উন্নতি সাধন করে। **(মলফূযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৬৮-৬৯)**

এই হল এস্তেগফারের প্রকৃত দর্শন যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বুঝিয়েছেন। অতএব, হাদীসে বর্ণিত মধ্যবর্তী দশক মাগফিরাতের (বা ক্ষমা লাভের) কারণ, এই ক্ষমা লাভ তখনই হবে যখন আল্লাহ্ তা'লার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। আর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একবার ক্ষমা লাভ হলে, ক্ষমা লাভের ব্যবস্থা শুরু হয়ে গেলে, তিনি সন্তুষ্ট হয়ে গেলে সেই মর্যাদাও লাভ হবে।

আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যও প্রত্যেকের স্বীয় যোগ্যতা অনুযায়ী লাভ হবে। কারণ, সবার মাঝে কোন কিছু লাভ করার বা অর্জন করার একটি শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে। সেই (শক্তি) অনুযায়ীই প্রত্যেকের উন্নতি হয় আর এস্তেগফারের মাধ্যমে সেই উন্নতি লাভ হয়। যাহোক, প্রত্যেককে এর জন্য চেষ্টা করতে থাকা উচিত। আর যেমনটি আমি পূর্বে বলেছিলাম, রমযান মাসের শেষ দশকে **'লাইলাতুল কদর'** লাভ করার আশায় মু'মিনদের ইবাদতে গতি সঞ্চরিত হয়। আর যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, শেষ দশক জাহান্নাম থেকে মুক্তিরও কারণ হয়। এজন্যও ইবাদতের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। এরপর তা অর্জনের লক্ষ্যে প্রত্যেকে নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টাও করতে থাকে।

'লাইলাতুল কদর' একটি গভীর ও ব্যাপক বিষয়। এ সম্পর্কেও কিছুটা ব্যাখ্যা করব কিন্তু এর পূর্বে যেহেতু শেষ দশকে এতেকাফে বসা হয়। তাই এতেকাফ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। কিছু কথা এতেকাফে যারা বসেছেন তাদের জন্য আর কিছু কথা অন্যদের জন্য, এগুলোর প্রতি প্রত্যেক আহমদীর দৃষ্টি রাখা উচিত।

প্রথমতঃ মনে রাখবেন যে, এতেকাফ রমযানের একটি নফল (বা অতিরিক্ত) ইবাদত। তাই স্থান সংকুলান এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় মসজিদ অথবা শহরের অন্যান্য মসজিদে এতেকাফে বসার অনুমতি দয়া হয়। অনেকে জোর দিয়ে বলে, আমরা অবশ্যই এতেকাফে বসবো আর অমুক মসজিদেই বসবো। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রাবওয়াতে মসজিদ মুবারকে অথবা মসজিদ আকসাতে বসবো কিংবা এখানে মসজিদ ফযলে অথবা মসজিদ বাইতুল ফুতুহে বসবো। আর এজন্যও পীড়াপীড়ি করে, উপর্যুপরি চিঠি লিখে এবং সুপারিশের জন্য আবেদনপত্র প্রেরণ করে। অতএব, এই রীতি ঠিক নয়। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ হলে দোয়া যে কোন স্থানেই কবুল হতে পারে। একথা বলেন নি যে, যারা এতেকাফে বসবে তারা **'লাইলাতুল কদর'** লাভ করবে আর বাকিরা লাভ করবে না। কোন বিশেষ স্থান তো নির্ধারিত নেই; তবে হ্যাঁ, কোন কোন স্থানের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে আর সেগুলোর নিকটে

থাকার কারণে অনেক সময় আবেগানুভূতিতে বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়, কিন্তু আমরা অমুক জায়গায় বসবোই– এমন ধারণা অবশ্যই ভুল। কখনো কখনো মানুষের কেবল এই ধারণা হয় যে, গত বছর অমুকে বসেছিল তাই এ বছর আমাদের সুযোগ দেয়া হোক অথবা এবছর আমরা অবশ্যই বসবো। এটিতো দেখাদেখি বিষয় বা লৌকিকতা হয়ে গেল, পুণ্যকর্মে সমৃদ্ধ হওয়ার বিষয়টি আর থাকে না।

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, **"মহানবী (সা.) প্রতি রমযানে এতেকাফ করতেন। এক রমযানে ফজরের নামাযের পরে তিনি (সা.) তাঁর তাঁবুতে প্রবেশ করলে হযরত আয়েশা (রা.) এতেকাফে বসার অনুমতি চান, তখন তিনি (সা.) তাঁকে অনুমতি দান করেন। তিনিও এতেকাফে বসার জন্য তাঁবু খাঁটান। (এদিকে) হযরত হাফসা (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)'র এতেকাফে বসার কথা শোনামাত্র তিনিও এতেকাফে বসার জন্য তাঁবু খাঁটান। হযরত যয়নব (রা.) এই সংবাদ শুনলে তিনিও তাঁবু খাঁটিয়ে নেন। পরের দিন প্রত্যূষে মহানবী (সা.) যখন চারটি তাঁবু খাঁটানো দেখতে পান তখন তিনি (সা.) বলেন, এগুলো কী? তখন তাঁকে (সা.) উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের অবস্থা জানানো হয়।** (অর্থাৎ, প্রত্যেকেই পরস্পরের দেখাদেখি তাঁবু খাঁটিয়েছে যাতে এই সুযোগে মহানবী (সা.)-এর নৈকট্য লাভ করা যায়।) **এতে মহানবী (সা.) বলেন, কোন্ বিষয়টি তাদেরকে এরূপ করতে বাধ্য করেছে, সেটি কি নেকী? এই তাঁবুগুলো সরিয়ে ফেল, এগুলো যেন আমি আর না দেখি। অতএব, সেই তাঁবুগুলো তুলে ফেলা হয়। অতঃপর মহানবী (সা.) ঐ রমযানে আর এতেকাফ করেন নি। নিজের তাঁবুও তুলে নিয়েছেন। যদিও** (বর্ণনানুযায়ী) **তিনি** (সে বছর) **শওয়াল** (মাসের) **শেষ দশকে এতেকাফ করেছিলেন।"** **(বুখারী কিতাবুল এতেকাফ, বাব এতেকাফু ফি শওয়াল)**

এসব লোক-দেখানো পুণ্যকর্ম বিদ'আতে রূপান্তরিত হয়। মহানবী (সা.) বিদ'আতের প্রসারকে সহ্য করতে পারতেন না। পুণ্যকর্মের আকাঙ্ক্ষা তো হৃদয় থেকে উৎসারিত হওয়া উচিত। আর এর বহিঃপ্রকাশও এমনভাবে হওয়া উচিত যেন মনে হয় যে, পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা হৃদয় থেকে উৎসারিত হচ্ছে। এমন যেন মনে না হয় যে, (মানুষের) দেখাদেখি সব কাজ হচ্ছে। উম্মাহাতুল মু'মিনীন তথা মু'মিনদের মাতাগণও নিশ্চিতরূপে পুণ্যের কারণেই এতেকাফে বসে থাকবেন যে, মহানবী (সা.)-এর সাহচর্যে আমরাও সেসব কল্যাণ থেকে অংশ লাভ করি, যা এই দিনগুলোতে করা উচিত; কিন্তু লোক-দেখানো কোন পুণ্যকর্মের সামান্য বহিঃপ্রকাশ ঘটানোও মহানবী (সা.) একদম সহ্য করতেন না। তাই তিনি (সা.) সবার তাঁবু অপসারণ করান।

এরপর তিনি (সা.) আমাদেরকে একথাও বলেছেন যে, এতেকাফে কীভাবে বসা উচিত, এতেকাফকারী এবং অন্যদের জন্য কী কী বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বর্ণনায় এসেছে, **"তিনি (সা.) রমযানের শেষ দশকে এতেকাফ করেছেন। তাঁর (সা.) জন্য খেজুরের শুকনো শাখার হুজরা বা কক্ষ বানানো হয়। একদিন তিনি (সা.) বাইরে উঁকি দিয়ে বলেন, নামাযী তার প্রভুর সাথে একান্ত**

আলাপচারিতায় নিমগ্ন থাকে তাই পরস্পরকে শোনানোর উদ্দেশ্যে ক্বিরাআত বিল্ জাহার বা উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ না করা আবশ্যক।" **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৭, বৈরুত থেকে মুদ্রিত)**

অর্থাৎ, মসজিদে অন্য লোকেরাও এতেকাফে বসে থাকবে তাই তিনি (সা.) বলেন, মু'তাকিফ (অর্থাৎ, এতেকাফকারী) তার প্রভুর সাথে একান্ত আলাপচারিতায় মগ্ন থাকে, দোয়া করতে থাকে। তুমি যদি নামাযেও কুরআন পাঠ কর অথবা এমনিতেই তিলাওয়াত করার সময় উচ্চস্বরে পড়ো না যাতে অন্যদের অসুবিধা না হয়; মৃদুস্বরে তিলাওয়াত করা উচিত। তবে এটি ছাড়া অর্থাৎ, জামাতী ব্যবস্থাপনায় কোন কোন মসজিদে এখন নির্ধারিত সময়ে দরসের ব্যবস্থা করা হয়। এটি একটি জামাতী ব্যবস্থাপনার অধীনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান। এটি ছাড়া প্রত্যেক এতেকাফকারীর জন্য উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করা অথবা উচ্চস্বরে নামায পড়া সমীচীন নয় কেননা, এভাবে অন্যদের অসুবিধা হয়। কাজেই, এগুলো হল মহানবী (সা.) বর্ণিত সাবধানতা। কোথায় এসব সাবধানতা? আর আজকের অবস্থা হল অর্থাৎ পূর্বে কখনো কখনো রাবওয়াতে এমনটি দেখা যেত কিন্তু বাইরের অন্যান্য শহরে এখনও দেখা যায়, সম্ভবত এখানেও হয়তো এই অবস্থাই হবে! এতেকাফকারীর জন্য (এটি) খুবই কষ্টদায়ক অবস্থা হয়, অর্থাৎ সে ইবাদতে মগ্ন থাকে আর পর্দা হিসেবে একটি চাদরই টানানো থাকে মাত্র। পর্দার আড়াল থেকে মিষ্টি এবং চিরকুটসহ একটি হাত ভেতরে আসে যাতে লেখা থাকে, আমার জন্য দোয়া করবেন অথবা নামাযী সিজদারত থাকে আর ওপর থেকে পর্দা উন্মুক্ত থাকে তখন ওপর থেকে একটি চিরকুট এসে তার ওপরে পড়ে আর (তাতে ব্যক্তির নাম) লেখা থাকে; আমার জন্য দোয়া করবেন। অথবা পর্দার পেছন থেকে নিচুস্বরে একটি গুরুগম্ভীর শব্দ ভেসে আসে যে, আমি অমুক– আমার জন্য দোয় করুন। এগুলো সবই ভুল রীতি।

এরপর সন্ধ্যায় ইফতারপর্ব আরম্ভ হয়। ট্রে ভর্তি করে ইফতারির পসরা সাজিয়ে পরিবেশন করা হয় যা এতেকাফকারীর পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয় কিন্তু এতে করে মসজিদে শোরগোল সৃষ্টি হয় এবং (মসজিদ) নোংরাও হতে থাকে। আর যারা ইফতারি পাঠায় (তাদের) কেউ কেউ বেশ দম্ভভরে বলে, আজ আমি ইফতারির আয়োজন করেছিলাম, কেমন ছিল? অথবা অন্যদের বলে বেড়ায় যে, (ইফতারিতে) এগুলো ছিল। আমার ইফতারি পছন্দ করা হয়েছে। এরপর পরদিন আরেকজন এর চেয়েও বেশি ইফতারির আয়োজন করার চেষ্টা করে। কাজেই, এগুলো সবই দম্ভ ও অহংকারের পর্যায়ভুক্ত। সেবার পরিবর্তে এগুলো লৌকিকতায় রূপ নেয়। তাই এতেকাফকারী হয় নিজের বাড়ি থেকে সেহ্‌রী এবং ইফতারি আনান অথবা জামাতী ব্যবস্থাপনায় সরবরাহ হবে। নামসহ প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা ইফতারি পাঠানোর রীতি সঠিক নয়। কোথাও জামাতের মসজিদে এমনটি হওয়া উচিত নয়। কেননা, এরফলে ভবিষ্যতে অন্যান্য বিদ'আতও বিস্তার লাভ করতে থাকবে। রাবওয়াতেও দারুয্ যিয়াফত থেকে কেন্দ্রীয় মসজিদসমূহে যারা এতেকাফে বসেন তাদের জন্য এবং আমার ধারণা

অন্যান্য স্থানেও (যদি না হয়ে থাকে তবে হওয়া উচিত) ইফতারি ও সেহ্‌রী সেখান থেকেই প্রস্তুত হয়ে যায় এবং সবাই এক জায়গায় বসে খান।

এছাড়া কেউ কেউ এতেকাফে বসেও কিছু সময়ের জন্য জাগতিক কাজকর্ম সেরে নেয়। উদাহরণস্বরূপ, নিজের ছেলেকে অথবা কর্মচারীকে বলে দেয়, আমাকে অমুক সময় এসে কাজকর্মের রিপোর্ট দিয়ে যেও। ব্যবসা-সংক্রান্ত পরামর্শ নিতে চাইলে অমুক সময় আসবে– আমি পরামর্শ দিব; এই রীতিও ভুল। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া এমন কাজ করা উচিত নয়। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মানুষ যখন এতেকাফে বসে তখন তার জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কথাবার্তা বলতে পারবে কিনা? তিনি (আ.) বলেন, একান্ত প্রয়োজন পড়লে বলতে পারে আর অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেতে পারে এবং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে যেতে পারে। তিনি (আ.) বলেছেন, একান্ত প্রয়োজন সাপেক্ষে, এমন নয় যে, যেমনটি আমি পূর্বে বলেছি, (তাই বলে) প্রতিদিন একটি সময় নির্দিষ্ট করে নেয়া, অমুক সময় চলে আসবে তখন বসে ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলবো। ঘটনাক্রমে যদি এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, কোন সরকারী নথিতে স্বাক্ষর করতে হবে, নির্ধারিত মেয়াদ পার হয়ে যাচ্ছে অথবা জরুরী কোন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে যার তারিখ শেষ হয়ে যাচ্ছে অথবা অন্য কোন জরুরী কাগজ হলে হতে পারে কিন্তু সবসময় (বা) প্রতিদিন নয়। **(বদর, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯০৭, পৃষ্ঠা: ৫)**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে বলেছেন, অসুস্থ্য ব্যক্তিকে দেখতে যেতে পারে। কারও কারও মতামত হল, (মসজিদ থেকে) বের হওয়া উচিত নয়। এটিও হুবহু মহানবী (সা.)-এর শিক্ষাসম্মত।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) এতেকাফ রত অবস্থায়ও রোগী দেখতে যেতেন। অতএব, তিনি (সা.) সেখানে (বেশিক্ষণ) অবস্থান না করে তার (স্বাস্থ্যের) খবরা-খবর নিতেন।" **(আবু দাউদ, কিতাবুস্ সিয়াম, বাবুল মু'তাকেফু ইয়াউদুল মারীয)**

অনুরূপভাবে ইবনে ঈসা'র এমনই একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। রোগীর সেবা-শুশ্রূষা বৈধ কিন্তু যান এবং চলে আসেন। এমন নয় যে, সেখানে বসে খোশগল্প করে সময় নষ্ট করতে আরম্ভ করে দিলেন অথবা বিভিন্ন আলাপচারিতা শুরু হয়ে যাবে। আর এমন পরিস্থিতিতে এখানে এটিও উল্লেখ্য যে, (মদীনাতে বাড়িঘর কাছাকাছি ছিল) বাড়ি নিকটে হলে আর বিশেষ কোন রোগীর খোঁজখবর নিতে হলে (সে কথা ভিন্ন) কেননা (আপনি যদি) নিকটস্থ প্রত্যেক রোগী, পরিচিত জনের কাছে যতে আরম্ভ করেন তাহলে কঠিন হবে! আর এখানে দূরত্বও অনেক। দৃষ্টান্তস্বরূপ যাতায়াতেই দু'ঘন্টা লেগে যাবে। যানজটে আটকে গেলে আরও বেশি সময় লাগবে। এখানে নিকটস্থ ঘরবাড়িতে পায়ে হেঁটে যতটুকু যেতে পারেন– তার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এমনিতেও যাওয়ার জন্য জামাতী ব্যবস্থাপনা থেকে অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক। আমার একথাগুলো বলার কারণ হল, কেউ কেউ এ ধরণের প্রশ্ন পাঠায়।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়া (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) (একবার) এতেকাফরত ছিলেন, আমি রাতের বেলা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই। আমি তাঁর (সা.) সাথে কথাবার্তা বলি। আমি যখন (আলাপ শেষে) উঠে দাঁড়াই এবং ফিরে আসি তখন তিনিও আমার সাথে আসেন। হযরত সাফীয়া (রা.)'র থাকার জায়গা তখন হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)'র বাড়িতে ছিল। পথিমধ্যে আনসারীদের সাথে দেখা হয়। তারা মহানবী (সা.)-কে দেখে দ্রুত হাঁটতে থাকেন। তিনি (সা.) (সেই আনসারীদের) বলেন, স্বাভাবিকভাবেই হাঁটো। ইনি হলেন, সাফীয়া বিনতে হুয়ী। তারা উভয়ে একথা শুনে বলেন, সুবহানাল্লাহ্; হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার সম্বন্ধে আমাদের এমন ধারণা কখনোই হতে পারে না। তিনি (সা.) বলেন, না; শয়তান রক্তের মত মানুষের শিরায় উপশিরায় প্রবাহমান। আমার ভয় হল, শয়তান আবার কোথাও তোমাদের হৃদয়ে কুমন্ত্রণা না সৃষ্টি করে দেয়।" **(আবু দাউদ, কিতাবুস্ সিয়াম, বাবুল মু'তাকিফু ইয়াদখুলুল বাইতাল হাজাতা)**

কাজেই, প্রথমতঃ তিনি (সা.) এখানে শয়তানী কুপ্ররোচনাকে দূর করার চেষ্টা করেছেন। তিনি (সা.) বলে দেন, ইনি হযরত সাফীয়া (রা.); (আমার) একজন পবিত্র সহধর্মিণী। দ্বিতীয়তঃ এতেকাফরত অবস্থায় মসজিদ থেকে বাইরে সামান্য দূর পর্যন্ত গেলে কোন সমস্যা নেই। বরং যদি মসজিদে প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেয়ার ব্যবস্থা না থাকে, গোসলখানা প্রভৃতির সুবিধা না থাকে আর বাড়ি নিকটেই হয় তাহলে সেখানেও যাওয়া যেতে পারে। বর্তমানে তো প্রতিটি মসজিদের সাথেই এই ব্যবস্থা রয়েছে, তাই এ ধরণের কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এরপরও কিছুক্ষণের জন্য মসজিদের আঙ্গিনায় অথবা বাইরে পায়চারি করার প্রয়োজন মনে করলে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বৈঠকে উপবিষ্ট ছিলেন। সে দিনগুলোতে খাজা কামাল দ্বীন সাহেব এবং ডাক্তার ইবাদুল্লাহ্ সাহেব এতেকাফে বসে ছিলেন, তখন তিনি (আ.) তাদেরকে বলেন, "এতেকাফের জন্য এটি আবশ্যক নয় যে, মানুষ (সারাক্ষণ) ভেতরেই বসে থাকবে আর একেবারেই কোথাও যাওয়া আসা করবে না। মসজিদের ছাদে গিয়ে আপনি রোদে বসতে পারেন, কারণ এখানে নিচে ঠাণ্ডা বেশি।" সেখানে তো হিটিং (Heating) এর ব্যবস্থা ছিল না। সবারই জানা যে, শীতকালে মানুষ রোদ পোহায়। "অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথা বলতে পারে। প্রয়োজনীয় বিষয়াদির প্রতি খেয়াল রাখা উচিত। আর এমনিতে তো (মু'মিনের) সব কাজই ইবাদত হয়ে থাকে।" **(মলফূযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৮৭-৫৮৮, আল্ হাকাম, ২ জানুয়ারি, ১৯০৩)**

কাজেই, মু'মিন হয়ে থাকলে এমন কোন সমস্যা সৃষ্টি হবে না।

হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, **"মহানবী (সা.) যখন এতেকাফে বসতেন তখন তিনি তাঁর মাথা আমার দিকে এগিয়ে দিতেন আমি তাঁর চুল আঁচড়ে দিতাম আর তিনি (সা.) কেবল প্রাকৃতিক প্রয়োজনেই ঘরে আসতেন।"** **(আবু দাউদ, কিতাবুস্ সিয়াম, বাবুল মু'তাকিফু ইয়াদখুলুল্ বাইতাল হাজাতা)**

কেউ কেউ এত কঠোর হন যে, তাদের ধারণা হল, এতেকাফরত অবস্থায় যদি মহিলা বা স্ত্রীর হাতের স্পর্শও লেগে যায় তাহলে না জানি কত বড় গুনাহ্ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয়তঃ অবস্থা বানানো হয়, এমন এলোমেলো চেহারা সুরত বানানো, চোখে মুখে যতক্ষণ পর্যন্ত গুরুগম্ভীর ভাব না আসে আর অবস্থাও খারাপ না হওয়া পর্যন্ত মানুষ ভাবে, অন্যরা বুঝতে পারবে না যে, এই ব্যক্তি ইবাদত করছে; এটি ভুল রীতি। অতএব, এটিও জানা যায় যে, এতেকাফের সময় নিজের অবস্থাও সুন্দর করে রাখা উচিত এবং পরিপাটি থাকা উচিত। আর দ্বিতীয়তঃ স্ত্রী অথবা মাহ্রাম (অর্থাৎ, বিয়ে শাদি বৈধ নয় এমন) কোন আত্মীয় মসজিদে এলে তার দ্বারা আপনি যদি মাথায় তেল লাগিয়ে নেন কিংবা চুল আঁচড়িয়ে নেন তাহলে কোন সমস্যা নেই।

রমযানের শেষ দশকে মহানবী (সা.)-এর ইবাদতের মান কেমন হতো। তাঁর (সা.) তো সাধারণ দিনের ইবাদত বন্দেগীও এমন ছিল যা থেকে বুঝা যায়, এতে আরো কী কী বৃদ্ধি হতে পারে। কিন্তু তিনি (সা.) রমযানের শেষ দশকে এক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতেন। হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রমযানে যখন এক দশক অবশিষ্ট থাকতো তখন মহানবী (সা.) কোমর বেঁধে নিতেন আর নিজ পরিবার থেকে এই দিনগুলোতে একেবারেই পৃথক থাকতেন; মসজিদে চলে যেতেন আর চব্বিশ ঘন্টা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতে মশগুল থাকতেন। কাজেই, অল্পক'দিনের মধ্যেই এই শেষ দশক আমাদের মাঝেও যাবতীয় কল্যাণরাজিসহ আসন্ন, ইনশাআল্লাহ্। আমাদেরও নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী এই দিনগুলোতে নিজেদের ইবাদতকে আরো সুসজ্জিত এবং এতে উন্নতি সাধন করা উচিত। এস্তেগফার এবং ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হোন যাতে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত হতে পারেন। এই শেষ দশকে যে লাইলাতুল কদর আসে তা লাভ করতে পারেন আর এই অঙ্গীকার করুন, এই দিনগুলোতে আমাদের যেসব ইবাদতের অভ্যাস সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোকে আমরা সদা ধরে রাখবো।

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে আর আত্মজিজ্ঞাসা করত রমযানের রোযা রাখে তার অতীতের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং আত্মজিজ্ঞাসা করত লাইলাতুল কদরের রাতে (ইবাদতের জন্য) দণ্ডায়মান হয়, তার বিগত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"** **(বুখারী, কিতাবুস্ সিয়াম, ফাযলু লাইলাতিল কদর, বাব ফাযলু লাইলাতিল কদর)**

এখন এখানে লক্ষ্য করুন! রোযা রাখা, লাইলাতুল কদরের রাতে দাঁড়ানো অর্থাৎ; লাইলাতুল কদরের রাতে ইবাদত। এই দু'টির সাথে শর্ত হল, প্রথমতঃ ঈমানের ওপর থাকতে হবে; মু'মিন হতে হবে ও আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে। মু'মিন সে-ই যে ঈমানের সকল শর্ত পূর্ণ করে; নিছক বুলিসর্বস্ব নয়। এখন শর্তগুলো কী কী? পবিত্র কুরআনে অগণিত শর্তের উল্লেখ রয়েছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হল, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমান। মু'মিনতো সে-ই যে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে। এর দৃষ্টান্ত দিয়ে দিচ্ছি।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (সূরা আল্ আনফাল: ৩) অর্থাৎ, মু'মিন কেবল তারাই যাদের (সামনে) আল্লাহ্র (নাম) (স্মরণ করা) হলে তাদের হৃদয় ভীত-ত্রস্ত হয়। অতএব, যার হৃদয়ে আল্লাহ্র ভয় থাকবে সে কখনো অন্যের অধিকার খর্ব করার কথা চিন্তাও করবে না। সে কখনো সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার চিন্তাও কখনো করবে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হল, সমাজে সবাই একসাথে মিলেমিশে সুন্দরভাবে বসবাস কর। প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর, নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, অন্যের জন্য ত্যাগ-স্বীকার কর আরও এমন অসংখ্য আদেশ রয়েছে। অতএব, এসব বিষয় (নিজেদের ভেতর) থাকলে তবে গিয়ে ঈমানের অবস্থা হবে আর তখনই খোদাভীতিও হৃদয়ে থাকবে অথবা আল্লাহ্ তা'লার ভয়ের কারণে এসব কাজ হবে। অতএব, ইবাদতের পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলী পালন আর আত্মবিশ্লেষণ করা আর অহর্নিশি এটি খতিয়ে দেখবে যে, আমি (আল্লাহ্ তা'লার) ভয়ে-ভয়ে দিন কাটিয়েছি কিনা আর তাক্বওয়া (অথাৎ, খোদাভীতির) সাথে রাত অতিবাহিত করেছি কিনা? যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন। এমন অবস্থা হলেই হুযূর (আ.) বলেছেন, এমন লোকদের রোযাও কবুল হবে এবং লাইলাতুল কদরের কল্যাণরাজিও অর্জিত হবে। আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের সম্পর্কে বলেন, এরাই মহাপ্রতিদান অর্জনকারী। এছাড়া প্রত্যেক মু'মিনের **'লাইলাতুল কদরের'** রজনী কোনটি– তা জানার বাসনা থাকে। সেগুলো কোন রজনী যখন আমরা আল্লাহ্ তা'লার এই অনুগ্রহরাজি থেকে অংশ পেতে পারি।

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, **রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রজনীগুলোতে লাইলাতুল কদর সন্ধান কর**।" **(বুখারী, কিতাবু ফাযলু লাইলাতুল কদর, বাব তাহ্রী লাইলাতুল কাদরি ফিল ওয়াত্রি মিনাল 'আশরিল আওয়াখিরী)**

অর্থাৎ, তেইশতম, পঁচিশতম, সাতাশতম ইত্যাদি রাতে সন্ধান কর।

হযরত ইবনে উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর অগণিত সাহাবীকে রূ'ইয়া (বা সত্য স্বপ্নে) রমযানের শেষ সাত রজনীতে লাইলাতুল কদর দেখানো হয়। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমি লক্ষ্য করছি, তোমাদের স্বপ্নগুলোতে রমযানের শেষ সাতটি রজনীতে লাইলাতুল কদর হওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য পাওয়া যায়। অর্থাৎ, তাদের সবার মাঝে প্রায় একই বিষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে। অতএব, তোমাদের মাঝে যে-ই একে সন্ধান করতে চায় সে (যেন) একে রমযানের শেষ সাতটি রজনীতে সন্ধান করে।" **(বুখারী, কিতাবু ফাযলু লাইলাতিল কদর, বাবু ফাযলু লাইলাতিল কদর)**

যাহোক, বিভিন্ন বর্ণনায় শেষ দশক অথবা সাতটি রজনীর উল্লেখ রয়েছে।

এরপর একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র নবী! আমি যদি লাইলাতুল কদর লাভ করি তাহলে আমি কি দোয়া করব? তিনি (সা.) বলেন, লাইলাতুল কদরের সৌভাগ্য হলে এই দোয়া করবে,

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

অর্থাৎ, **হে আল্লাহ্! তুমি অতীব ক্ষমাশীল এবং ক্ষমাকে ভালোবাস। অতএব, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"** **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, বাকী মুসনাদ আল্ আনসার)**

মহানবী (সা.) এই দোয়া শিখিয়েছেন, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অন্য কোন দোয়া করা উচিত নয়। সেগুলোও করুন কিন্তু ওপরে আমি যে হাদীস বর্ণনা করেছি এর সাথে যোগ করুন; তাহলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয় অর্থাৎ, ঈমান এবং আত্মবিশ্লেষণ করত লাইলাতুল কদর লাভ করলে তার অর্থ পাপ ক্ষমা হয়েছে। একজন মু'মিন যখন আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই দোয়া করে, হে খোদা! এই রমযানে আমি নিজের যাবতীয় পাপ এবং অবাধ্যতা নির্ণয় করতে থেকেছি আর এখন আমি অঙ্গীকার করছি যে, ভবিষ্যতে আমি চেষ্টা করব এসব ভুলত্রুটি এবং অবাধ্যতা যেন আমার দ্বারা সংঘটিত না হয়। তুমি ক্ষমাকারী; তুমি ক্ষমা, মাফ করা ও মার্জনাকে ভালোবাস। তুমি আমার গুনাহ্ ক্ষমা কর এবং আমার অবাধ্যতাকে মার্জনা কর।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেমনটি বলেছেন, এস্তেগফার এবং পাপ থেকে ক্ষমা লাভ তওবা কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আর আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যে মানুষ পুনরায় এমন পুণ্যকর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করে আর তখন আল্লাহ্ তা'লাও এমন লোকদের সাহায্য করেন। কাজেই, যারা এভাবে দোয়া করে আর আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের মানও প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে এবং বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানেও সচেষ্ট থাকে, তাই তারা ক্ষমা এবং মার্জনার দোহাই দিয়ে আল্লাহ্ তা'লার কাছে প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ তা'লা তার সদুদ্দেশ্যে কৃত দোয়াকে স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গ্রহণও করেন। তাকে পুণ্যকর্মে উন্নতিও দান করেন। কাজেই এসব ক্ষমা, মার্জনা বা ক্ষমা করা এবং এস্তেগফার এগুলো কোন সামান্য দোয়া নয় বরং অনেক বড় দোয়া। মানুষ যদি পরিপূর্ণরূপে নিজের আত্মজিজ্ঞাসা করে প্রার্থনা করে, (তাহলে সে) অনেক মন্দকর্ম পরিত্যাগ করবে আর আল্লাহ্র শরণাপন্ন হবে যেন ক্ষমার উপায়-উপকরণ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দিন আমরা যেন এই চেতনা নিয়ে আল্লাহ্র সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে মার্জনা এবং ক্ষমাপ্রার্থী হই।

এরপর যেমনটি আমরা জানি এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে এই জ্ঞান দিয়েছেন, লাইলাতুল কদরের অর্থ নিছক এটিই নয় যে, রমযানের শেষ দশকের কয়েকটি রাত থেকে একটি রাত এলো আর তাতে দোয়া করলাম; ব্যস হয়ে গেল বরং এর আরো অনেক গভীর অর্থ রয়েছে।

তিনি (আ.) বলেন, **"লাইলাতুল কদর** হল সেই সময় যা রাতের শেষ প্রহরে এসে থাকে যখন আল্লাহ্ তা'লা আত্মপ্রকাশ করেন এবং (এই বলে) হাত বাড়িয়ে দেন, কোন প্রার্থনাকারী এবং এস্তেগফারকারী কি আছে যার ফরিয়াদ আমি গ্রহণ করবো; কিন্তু এর আরেকটি অর্থ আছে দুর্ভাগ্যবশতঃ

আলেম-ওলামা যার বিরোধী এবং (যা) অস্বীকার করে আর তা হল এই যে, আমরা কুরআনকে ঘোর অমানিশার রাতে অবতীর্ণ করেছি আর তা (সেই রাত) একজন প্রতিশ্রুত সংস্কারকের আকাঙ্খী ছিল। খোদা তা'লা মানুষকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যেমনটি তিনি বলেন, مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (সূরা আয্ যারিয়াত : ৫৭) মানুষকে যেহেতু ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন তাই এটি হতে পারে না যে, তারা অমানিশাতেই পড়ে থাকবে। এমন যুগে প্রকৃতিগতভাবেই তার সত্তা উদ্বেলিত হয়ে উঠে যেন কোন সংস্কারক জন্ম নেয়। অতএব, إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (সূরা আল্ কদর : ২) যুগের এই আবির্ভাবের চাহিদাও মহানবী (সা.)-এর আরেকটি প্রমাণ।"

(আল্ হাকাম, ১০ম খণ্ড, সংখ্যা ১০, তারিখ ৩১ জুলাই, ১৯০৬, পৃষ্ঠা: ৪)

তিনি (আ.) বলেন, শুধুমাত্র রমযানের শেষ দশকে আগত একটি রাতই **'লাইলাতুল কদর'** নয় বরং এর আরও অর্থ রয়েছে আর তা হল, পার্থিবতার আঁধারে পৃথিবী যখন নিমজ্জিত হয়ে যায় আর শির্ক (অংশীবাদীতা) চরমে পৌঁছে, অনেক মানুষ খোদা তা'লাকে ভুলে যায় তখন আল্লাহ্ তা'লা এমন অবস্থায় আপন সৃষ্টিকে এই পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধারের জন্য কোন সংস্কারক নবী অথবা রসূল প্রেরণ করেন। আর এই পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হওয়ার যুগ সম্পর্কে বলা হয়েছে, অন্ধকার (মূলত) রাতের মতই। কাজেই তিনি (আ.) বলেন, সেটিও একটি তমসাচ্ছন্ন যুগ ছিল যখন শির্ক ছিল সাধারণ বিষয়। মানুষ আল্লাহ্কে ভুলে গিয়েছিল। তখন আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করেন এবং পৃথিবীবাসীকে এর অন্ধকার ও অমানিশা থেকে মুক্ত করার জন্য স্বীয় পবিত্র গ্রন্থ কুরআন করীম মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেন যা সর্বশেষ শরীয়ত গ্রন্থ।

মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আরেকটি অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ আসার কথা ছিল। এক হাজার বছরের যুগ– যে সম্পর্কে সৎ-চিন্তাশীল মুসলমানরা বলেছেন, **"ইসলামের কেবলমাত্র নামই অবশিষ্ট আছে এবং আমলের কোন নামগন্ধও নেই।"** এরপর আল্লাহ্ তা'লার রীতি এবং প্রতিশ্রুতি আর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের কথা ছিল এবং আবির্ভূত হয়েছেন। আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁকে (আ.) মানার তৌফিকও দিয়েছেন। আমরা যেহেতু মেনেছি তাই পৃথিবীতে আহমদীয়া জামাতই এখন একমাত্র সেই জামাত যাকে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাত হিসেবে পৃথিবী থেকে অমানিশা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। এখন একমাত্র আহমদীয়া জামাতকেই আল্লাহ্ তা'লা একাজে নিয়োজিত করেছেন।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "মহানবী (সা.)-এর নায়েবের আবির্ভাবের মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবে যে লাইলাতুল কদর নির্ধারণ করা হয়েছে তা মূলতঃ এই লাইলাতুল কদরেরই একটি শাখা। অথবা এভাবে বল যে, এর একটি প্রতিচ্ছায়া রয়েছে যা মহানবী (সা.) লাভ করেছেন। খোদা তা'লা এই লাইলাতুল কদরের মহামহিম মর্যাদাকে অনেক উঁচু করেছেন। যেমনটি এর স্বপক্ষে

এই আয়াত রয়েছে যে, فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ অর্থাৎ, কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত এই লাইলাতুল কদরের যুগে সকল প্রকার হিকমত ও মা'রেফাতের (অর্থাৎ, প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানের) কথা পৃথিবীব্যাপী প্রসার করে দেওয়া হবে। আর বিভিন্ন প্রকার অভাবনীয় জ্ঞান ও বিরল প্রযুক্তি, বিস্ময়কর শিল্পকর্ম এই ধরাপৃষ্ঠে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।" নিত্যনতুন উন্নতি এবং আধুনিক জ্ঞান হবে, নিত্যনতুন শিল্পকর্ম গড়ে উঠবে, নতুন নতুন জিনিষ আবিষ্কৃত হবে। এসবই সেই যুগে বিস্তৃত করা হবে।" আর মানুষের শক্তি-বৃত্তিতে তাদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী আর সম্ভাব্য বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান ও বুদ্ধির যে সুপ্ত সামর্থ্য রয়েছে অথবা তারা যতটুকু উন্নতি করতে পারে, তা সবই প্রকাশ করা হবে।" পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "কিন্তু এসবই সেই দিনগুলোতে পূর্ণ উদ্যমে হতে থাকবে। অর্থাৎ, যখন রসূলের কোন নায়েব পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবে আর মূলতঃ সূরা যিলযাল-এ এই আয়াতটিই সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, সূরা যিলযালের পূর্বে সূরা কদর অবতীর্ণ করে এটি প্রকাশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত এভাবেই অব্যাহত রয়েছে, অর্থাৎ খোদা তা'লার বাণী লাইলাতুল কদরেই অবতীর্ণ হয় আর তাঁর নবী লাইলাতুল কদরেই এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। আর লাইলাতুল কদরেই সেসব ফিরিশ্‌তা নাযিল হন যাদের মাধ্যমে পৃথিবীতে পুণ্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় আর তারা ভ্রষ্টতার তমশাচ্ছন্ন রাত থেকে আরম্ভ করে ঊষালগ্ন পর্যন্ত এই কাজে রত থাকে যাতে সক্ষম হৃদয়ের অধিকারীদের সত্যের পানে আকৃষ্ট করতে পারে।" **(এযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫৯-১৬০)**

অতএব, লক্ষ্য করুন! এখন বর্তমান যুগে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে এসব বিষয় প্রকাশিত হচ্ছে। যেমনটি আমি বলেছি, আর নিত্য-নতুন বিস্ময়কর আবিষ্কারাদিও হচ্ছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে যা কল্পনারও ঊর্ধ্বে ছিল। আর এক্ষেত্রে নিত্যদিন উন্নতিও সাধিত হচ্ছে।

১৯০৪ সালে, আজ থেকে শত বছর পূর্বে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিও এলহাম হয়েছিল। তিনি (আ.) বলেন, (আমাকে) একটি দৃশ্য দেখানো হয়, কোন একটি বিষয় উপস্থাপন করা হয় (একটি বিষয় উপস্থাপন করা হল) এরপর এলহাম হয়,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ للمسيح الموعود

অর্থাৎ, **'আমরা একে লাইলাতুল কদরে অবতীর্ণ করেছি। আমরা এটি মসীহ্ মওউদের জন্য অবতীর্ণ করেছি'**। যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন, হতে পারে এই এলহামটি সম্ভবত (নিত্য-নতুন) আবিষ্কারাদির প্রতিও ইঙ্গিত করছে; যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর আগমনের স্বপক্ষে হচ্ছে। কিন্তু এ বিষয়টি আমাদেরকে দোয়ার প্রতি অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতভুক্ত হয়ে এই অমানিশাকে দূর করার যে গুরুদায়িত্ব আমরা নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছি তা সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারি। এই জ্যোতির

আগমন সত্ত্বেও জগত অন্ধকারের পানে ছুটে চলেছে। তাদেরকে বুঝান, তাদেরকে বলুন, এখনও সময় আছে, বাঁচার চেষ্টা কর আর বাঁচো নতুবা ধ্বংসের অতল গহ্বরে পতিত হবে। দোয়া করুন এবং অনেক বেশি দোয়া করুন আর বিশেষ করে মুসলিম উম্মার জন্য, সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের বিবেক-বুদ্ধি দান করুন। এটি আমাদের ওপর অর্পিত অনেক বড় গুরুদায়িত্ব। কাজেই, এই দিনগুলোতে যথাযথভাবে দোয়া করার চেষ্টা করুন আর উম্মতে মুসলিমাও জামাতের জন্য কিছু সিজদা নিবেদিত করুন।

আমার দৃষ্টিতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর একটি চমৎকার উদ্ধৃতি রয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, **"আমি পুনরায় বলছি, ইসলাম আরেকটি লাইলাতুল কদরের কথা বর্ণনা করেছে। আর তা অর্থাৎ সেই লাইলাতুল কদর কল্যাণরাজির নিরিখে এতটাই সমৃদ্ধ যে রমযানের লাইলাতুল কদরের কলাণরাজিও এর মোকাবিলা করতে পারে না। এটি সেই লাইলাতুল কদর যা সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন।** إِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا। **শতাব্দীর শিরোভাগে আগমনকারী মুজাদ্দিদের যুগে সেই লাইলাতুল কদর আসে। কিন্তু এর চেয়েও বড় আরেকটি লাইলাতুল কদর আছে যা ১৩০০ বছর পরে এসেছে আর তা হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ। এই লাইলাতুল কদর বিগত তেরশ' রমযান মাসে আসা লাইলাতুল কদরের চেয়ে এবং প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদের যুগ আকারে প্রদর্শিত সেই এগারটি লাইলাতুল কদরের চেয়ে অধিক শ্রেয়। অতএব, সেই যুগ যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন (তা) সর্বশ্রেষ্ঠ লাইলাতুল কদর। নির্বোধ সেই ব্যক্তি যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মোকাবিলায় গাজ্জালী, বুখারী এবং রাযী'কে উপস্থাপন করে"** (যেসব ইমাম রয়েছেন) **"তারা তিনি (আ.)-এর মাহাত্ম্য সম্পর্কে অজ্ঞ। কেননা, তিনি (আ.) তো সেই ইমাম, যিনি কেবল একজন মুজাদ্দিদ নয় বরং বিগত ১৩শ' বছরের সকল মুজাদ্দিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এ কারণেই তাঁর লাইলাতুল কদর অন্যদের লাইলাতুলে কদরের চেয় শ্রেয়। কেননা, তাঁর লাইলাতুল কদরের যুগ নবুয়্যতের লাইলাতুল কদরের যুগ থেকে আরম্ভ হয় আর এটি মহানবী (সা.)-এর পরে দ্বিতীয় লাইলাতুল কদর ...। অতএব, লাইলাতুল কদর কী? একটি হল, নবীর যুগ আর অন্যটি হল নবীর আবির্ভাবের সময়। তোমরা এথেকে কল্যাণ লাভ কর এবং খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন কর।"** এখান থেকে মনোযোগ দিয়ে শুনুন **"এই লাইলাতুল কদরে খোদা তা'লার মনোনীত মহাপুরুষ একটি বীজ বপন করে যান যা পরবর্তীতে বিকশিত হয় এবং বৃদ্ধি লাভ করে। এটিই সেই রজনী যে সম্পর্কে খোদা তা'লা বলেন,** تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ **বলা হয়, পবিত্র কুরআনে হযরত ঈসা (আ.)-কে রূহ্ আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিন্তু আমি বলি, কালামুল্লাহ্কেও রূহ্ বলা হয়েছে আর মুজাদ্দিদকেও বলা হয়েছে কেননা, তারাও ঐশী বাণীর অধিকারী। অতএব, রূহ্ বলে আখ্যায়িত মুজাদ্দিদকে তোমাদের হিদায়াতের জন্য দাঁড় করানো হয়েছে। আর এটি সেই যুগ যাতে ফিরিশ্তারাও**

অবতীর্ণ হয়েছেন। আর এই রজনী শান্তি ও নিরাপত্তার রজনী যাতে প্রভাত পর্যন্ত ফিরিশ্‌তারা অবতীর্ণ হতে থাকে। অতএব, এখন যেহেতু উষাকাল আর সূর্যোদয় আসন্ন এবং সেই দিন উদীয়মান অর্থাৎ, (যখন) তোমার হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা দেয়া হবে, তোমাকে জনগণের শাসক নিযুক্ত করা হবে। জনগণ তোমার প্রজা হবে। তুমি মানুষের প্রাপ্য অধিকার প্রদান কর এবং তারা তোমার কাছে সেসব অধিকার প্রদানের দাবি জানায়। তুমি তখন শাসক হবে, নির্যাতিত হবে না ঠিকই কিন্তু বর্তমানে যেসব কল্যাণ তুমি লাভ করছ তা তখন তুমি পাবে না।" (অর্থাৎ) প্রজা হওয়ার কারণে যেসব কল্যাণ লাভ করছ শাসক হওয়ার পর তা আর লাভ করবে না। **"কেননা সেদিন হবে (পরস্পর) মতবিরোধ এবং বিবাদ-বিসম্বাদে পূর্ণ"**। সম্ভবত এভাবেই পুনরায় নৈরাজ্য দেখা দিতে আরম্ভ করবে। এর থেকে রক্ষা পাবার একটিই পথ রয়েছে অর্থাৎ, **"অতএব, ফজর বা প্রভাত উদিত হওয়ার পূর্বেই সাবধান হয়ে যাও; কেননা প্রভাত আসন্ন। তুমি এই সময় থেকে লাভবান হও আর নিজের আত্মিক সংশোধন করে নাও। খোদা তা'লা তোমাকে (এর) তৌফিক দান করুন।"** আমীন। **(খুতবাতে মাহমুদ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৭-৩৮৮)**

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)